

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)****A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No.422 - 428

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পে মাতৃত্বের স্বরূপ সন্ধান

দীপঙ্কর সরকার

গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: in.sarkardipankar@gmail.com**Received Date 20. 01. 2026****Selection Date 10. 02. 2026****Keyword**

Maternal
Character,
Motherhood,
Biological-
mother,
Emanation of
relational,
Idealism, Indian
literature, Blood-
son, Prevalent,
Society.

Abstract

Saratchandra Chattopadhyay in his writings has portrayed the happiness and Sorrows of a Bengali's life full of love, neglected and insulted by the society. The psychological side of the Bengali life story of happiness and sadness has been beautifully portrayed. In some short stories he has shown the failure side of love. Saratchandra's penchant for writing short stories does not exactly follow the short form of the story. His stories seem to be quite elaborate on the question of form. All the stories written by Saratchandra throughout his life have been compiled in three prologues of the publication 'Tuli Karam'. A close look at saratchandra Chattopadhyay short stories shows that he has made his stories the protagonists. And a unique originality can be found in those characters, that is in the creation of his mother character there has been a tendency in Indian literature since ancient times to glorify motherhood in various forms. The picture of mother and motherhood in Saratchandra's short stories is not the idealism of a list person, but a boundless reality. So in the story 'Baradidi' it is seen that madhavi, throughout the story is addressed as 'didi' but the way she, being didi, holds pramila with affection, affection and love, the emanation of relational rasa, follows vatsalya with on effortless case. Saratchandra Chattopadhyay, in the other hand, has written to reveal the nature of Surendra's mother's care and its results in order to become a real mother. The special aspect in revealing the nature of motherhood in her story is that the way she adopted the next son, who is not her own blood son, seems to be far beyond the love and tenderness of any normal mother for that reason, it can be said that Saratchandra painted a picture of motherhood in his short stories to sustain the concept of motherhood prevalent in our society Saratchandra Chatterjee didn't want to give importance to the biological mother in the creation of his maternal character.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মূলত উপন্যাসিক হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি বাংলা ছোটগল্পের জগতেও তিনি বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি তাঁর 'মন্দির'

গল্পটির জন্যে কুস্তলীন পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এবং সেই সূত্রেই শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব ও ক্রমশ আরো ভালো গল্পকার হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক সুব্রতকুমার দে লিখেছেন -

“শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিল্প-নিপুণতার চরম দাবী না রাখলেও তাঁর ছোটগল্পের বিষয় হয়েছে দাম্পত্য প্রেম, সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা ... সংসারে যারা শুধু দিলে, পেল না কিছুই সেই বধিতে, নিপীড়িত, অসহায় ও অবহেলিত মানুষদের কথাই বলতে চেয়েছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।”^১

সুতরাং সারা জীবনব্যাপী শরৎচন্দ্র যে সকল গল্পগুলি লিখেছেন, তা শুধুমাত্র কোন একটি বিষয়কে নিয়ে অগ্রসর হয়েছে তা নয়। তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য অনুপম এবং বহুমাত্রিক। তাঁর গল্পের বিষয় সবসময়েই নাগরিক জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেনি। শরৎচন্দ্রের গল্পের মৌলিক ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে পল্লীগ্রামের সাধারণ মানব-মানবীর সম্পর্কের পটে। সেখানে যেমন প্রকৃতি এসেছে, এসেছে প্রেম, তেমনি এসেছে অবলা প্রাণীর সঙ্গে মানুষের অবাক করা সম্পর্কের ছবি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প লেখবার প্রবণতা গল্পের ছোট অবয়বকে অনুসরণ করেছে তা নয়। তাঁর গল্পগুলি অবয়বের প্রক্ষে বৈচিত্র্য বিস্তারিত বলেই মনে হয়। সারাজীবনব্যাপী শরৎচন্দ্র যতগুলি গল্প লিখেছেন, তাদেরকে ‘তুলি কলম’ প্রকাশনীর তিনটি খণ্ডে সংকলিত করা হয়েছে। তবে অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত কয়েকটি গল্পের নাম উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য - ‘বড়দিদি’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘রামের সুমতি’ এবং ‘অভাগীর স্বর্গ’।

যে গল্পগুলিতে সেকালের সমাজ, বাস্তবতার সঙ্গে মাতৃহের একটা অসাধারণ যোগ স্থাপন করেছেন তার মধ্যে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বড়দিদি’কে শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গল্প রূপে চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন গবেষক অবশ্যই একে উপন্যাস বলতে চেয়েছেন। ইতিহাস বলে -

“শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে ১৩১৪ সালে তাঁর ‘বড়দিদি’ উপন্যাস রূপে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের মাতুল ও বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, শরৎচন্দ্র প্রথমে একে প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা প্রকাশিত হয়নি। ভারতীতে ‘বড়দিদি’ প্রকাশিত হবার কয়েক বছর পরে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ‘বড়দিদি’ বই আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করেন ‘যমুনা’র সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল।”^২

বিষয়বস্তুর বিচারে ‘বড়দিদি’কে একটি প্রেমের গল্প বলা যেতে পারে। যেখানে দেখা গেল সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিম অঞ্চলে ওকালতি করেন। কিন্তু সুরেন্দ্র প্রতিপালিত হয়েছেন তার বিমাতার কাছে। শরৎচন্দ্র সেখানে প্রমাণ করেছেন, বায়োলজিক্যাল মায়ের চেয়ে বিমাতাও কিভাবে স্নেহ-যত্ন ও আদরে একটি সন্তানকে উপযুক্ত করে তুলতে পারেন। তিনি লিখেছেন -

“সুরেন্দ্রের উপর তাহার আন্তরিক যত্নের এতটুকু ক্রটি ছিল না। তিরস্কার-লাঞ্ছনার পর-মুহুর্তে যদি তাহার চোখমুখ ছলছল করিত, রায়গৃহিণী সেটি জ্বরের পূর্বলক্ষণ নিশ্চিত বুঝিয়া, তিনদিনের জন্য তাহার সাণ্ড ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। মানসিক উন্নতি এবং শিক্ষাকল্পে তাহার আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে পরিষ্কার কিংবা আধুনিক রুচি-অনুমোদিত বস্তাদি দেখিলেই তাহার শখ এবং বাবুয়ানা পরিবার গুণ্ড ইচ্ছা তাহার চক্ষু স্পষ্ট ধরা পড়িয়া যাইত, এবং সেই মুহুর্তেই ২-৩ সপ্তাহের জন্য ... এমনিভাবে সুরেন্দ্রের দিন কাটিতেছিল।”^৩

শরৎচন্দ্রের যেকোনো গল্পের বিশেষত্ব এই যে, সেখানে একটি দারুণ সুস্পষ্ট কাহিনি বা আখ্যান থাকে। ‘বড়দিদি’ গল্পে তার কোন অন্যথা হয়নি। এখানে একটি আখ্যান অবশ্যই আছে, কিন্তু যে মাতৃহের ছবি এখানে চিত্রিত হয়েছে সেখানে জন্মদাত্রী মা অপেক্ষা সুরেন্দ্রের পালিত মাতার শাসন বড় হয়ে উঠেছে। সেই মায়ের শাসনে সুরেন্দ্র আর যাই শিখুক, বাস্তব জীবনের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। আসলে একটি শিশুর উপর তার মায়ের প্রভাব পরবর্তীকালে কি সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে, অত্যন্ত বাস্তবতা ও এক মনস্তাত্ত্বিক পরস্পরায় শরৎচন্দ্র তাকে উদ্বাসিত করে তুলেছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সুরেন্দ্র প্রমীলাকে পড়ানোর দায়িত্ব নিয়ে বিধবা মানবীদের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করতে আসেন।

এবং কখনো সুরেন্দ্রের চশমা নিয়ে কৌতুক কিংবা কখনো প্রমীলাকে পড়ানোর ব্যাপারে টুকরো টুকরো কথার সূত্রে মাধবী একদিন অনুভব করল সে সুরেন্দ্রকে ভালোবাসে।

সংসদে মাধবীর ভূমিকা বিশেষত প্রমীলার উপর তার আদর-যত্ন আসল মায়ের যত্নে কেউ ম্লন করে দিতে পারে। সুতরাং মাতৃত্বের মহত্ব শুধু রক্তের সম্পর্কে উপর নির্ভর করে না, শরৎচন্দ্র তাঁর এই গল্পে প্রমাণ করে দিয়েছেন। শুধু ভারতীয় বিশ্বাসে কেন, সারা পৃথিবীতে প্রায় সকল মানুষেরাই বিশ্বাস করেন, নারীর মুক্তি তার মাতৃত্বের ভিতর দিয়েই প্রাপ্ত হয়। সে ক্ষেত্রে মাতৃত্বের একটা গৌরব নিয়ে সারা পৃথিবীতেই লেখা হয়েছে কত কবিতা, গল্প, উপন্যাসসহ বিভিন্ন ধারা সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু গল্পে মাতৃত্বের গৌরব ঘোষণা করা হয়েছে। এই বিষয়ের উপর লেখা 'বিন্দুর ছেলে' ঠিক তেমনি একটি গল্প যেখানে মাতৃত্বের মহিমা উচ্চকিত হয়ে উঠেছে।

গল্পের শুরুতে দেখা যায়, যাদব মুখার্জী ও মাধব মুখার্জী এক মায়ের পেটের ভাই নন। কিন্তু যাদববাবু চরম স্নেহে মাদবকে পড়াশোনা পড়াশোনা শেখান এবং বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে তার বিবাহ দেন। কিন্তু মাধব ও বিন্দুবাসিনী নিঃসন্তান। তাইতো মা হবার একটা তীব্র যন্ত্রণা বিন্দুর ভিতর কাজ করে চলে। কিন্তু একটা সময়ে বড় বউ তার ছেলে অমূল্যকে বিন্দুর হাতে মানুষ করবার জন্যে দিলে বিন্দুর সন্তান স্নেহের পূর্ণতা পেতে থাকে। ওর আসল মা অল্পপূর্ণা তাতে বরং একটা স্বস্তি ও আনন্দে দিন কাটায়। শরৎচন্দ্র সেখানে লিখেছেন -

“ইহার বছর চারেক পরে যেদিন খুব ঘটী করিয়া অমূল্যের হাতেখড়ি হইয়া গেল ... অল্পপূর্ণা বাহিরে আসিয়া অমূল্যের সাজগোজ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাহার চোখে কাজল, কপালে টিপ, গলায় সোনার হার, মাথার উপর ঝুঁটি করিয়া চুল বাঁধা, পরনে একখানি হলদে রঙের ছোপানো কাপড়। এক হাতে দড়ি বাঁধা মাটির দোয়াত, বগলে ক্ষুদ্র একখানি মাদুর জড়ানো গুটিকয়েক তালপাতা। বিন্দু বলিল, দিদিকে প্রণাম করত বাবা। অমূল্য জননীকে প্রণাম করিল।”^৪

কিন্তু পারিবারিক নানা ওঠা-পড়ায় একটা সময়ে কাহিনীর বৃত্তে এলোকেশী ও তার ছেলে নরেনের আবির্ভাব। নয়নের পাল্লায় পড়ে যখন বিন্দু দেখে অমূল্য বিগড়ে যাচ্ছে, তখন তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আলাদা হয়ে যেতে চেয়েছে। বিন্দু অমূল্যের জন্মদাত্রী মা নয়। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সে অমূল্যের জীবনের নানা উঠাপড়ার আবর্তে আবর্তিত হয়েছে। চরম পারিবারিক বিবাদের কালে বিন্দু তার মায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এলোকেশী বিবাদের সুযোগ নিয়ে তার ছেলে নরেন্দ্রকে বিন্দুর কোলে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু বিন্দু বিশ্বাস করে এ বিবাদ সাময়িক। অমূল্য তার নিজের ছেলে না হলেও তার সাথে অমূল্যের সম্পর্ক চিরন্তন। মাতৃ হৃদয়ের এই ওঠা-পড়া একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হয় না। বিন্দু নিঃশব্দে তার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এলোকেশীকে বিন্দু জবাব দিতে না পারলেও বিন্দুর মা জমিদারের মেয়ে, জীবন ও জগত সম্পর্কে অনেকখানি সচেতন; তিনি বিন্দুর হয়ে এলোকেশীকে বললেন -

“ও কি একটা কথা গা! অমূল্য ওর হাড়েমাসে জড়িয়ে আছে। না না ওকে তোমরা অমন করে উতলা করে দিও না। বিন্দু ওদের ঝগড়া দুদিনের মা। তাই বলে ছেলে কি তোর পর হয়ে যাবে!”^৫

পরিণামে অবশ্য 'বিন্দুর ছেলে' একটা ইচ্ছে পূরণের কাহিনি হয়ে উঠেছে। অসুস্থ বিন্দু ফিরে পেয়েছে অমূল্যকে। আর যেভাবে নিজের ছেলে না হলেও অমূল্যের প্রতি বিন্দুর যে ব্যবহার ও টানাপোড়েন, তা চিরন্তন মাতৃত্বের গৌরবকে চিহ্নিত করেছে, এ কথা বলা যেতেই পারে।

সমাজ, বাৎসল্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাতা-সন্তানের সম্পর্কের মধ্যকার সম্পর্কটাকে অনেকেই বাৎসল্যের আধারে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু মাথা এবং সন্তানের ভিতর স্নেহেরও একটা তীব্র বন্ধন রয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর যে সব গল্পে মাতৃত্বের স্বাদ এসেছে, সেখানে তিনি মায়ের বাৎসল্যের সঙ্গে স্নেহকে একাকার করে দিয়েছেন। 'গ্রামের সুমতি' ঠিক তেমনি একটি গল্প। রামলালের মা মারা গেলে শ্যামলালের বউ নারায়ণীর হাতে তার লালন-পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গে ড. দিলীপ কুমার মিত্র লিখেছেন -

“শরৎ সাহিত্যে নারীত্বের সেই পরম পরিচয়, যে কল্যাণী নারী জননীরূপে কিম্বা কন্যারূপে আমাদের গৃহকে আমাদের সমাজকে মঙ্গলময় আনন্দ সমুজ্জ্বল করে রাখে। কখনো নারী জননীর মত আপন পর

নির্বিশেষে সবাইকে ভালো-বেসে চিরন্তনী মাতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। যেমন রামের সুমতি'র নারায়ণী ... হৃদয় গৌরব ও চরিত্র মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।”^৬

সম্পর্কে নারায়ণী, রামলালের বৌদি সম্পর্ক যুক্ত হলেও রামলালের উপর শাসন-গর্জন করে, তিনি রামলালকে মানুষ করে তোলবার চেষ্টা করেন। কখনো বা রামলাল স্কুলে যেতে না চাইলে তার মাথায় নারায়ণী হাত বুলিয়ে বলে, এবেলা রাম খেয়ে নিলে পরের বেলা তিনি রামকে খাইয়ে দেবেন। এমন স্নেহের পরশ পেয়ে রাম ভাত খেয়ে জামা পড়ে স্কুলে চলে যায়। কিন্তু রামলাল যে প্রচণ্ড দুরন্ত, নৃত্যকালী তার জন্যে নারায়ণীকে দায়ী করে বলে, তার আদরের রামলাল ডানপিটে হয়ে যাচ্ছে। উত্তরে তখন নারায়ণী বলেন, তারা শুধু আদরটাই দেখে, তার ভিতর স্নেহ এবং বাৎসল্যটা কেউ দেখল না।

বাৎসল্য এমন একটি অনুভব যার সাথে সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার সুগভীর টানের গভীরতার একটি ক্ষেত্র সেই বাৎসল্য আমরা লক্ষ্য করেছি বৈষ্ণব পদাবলীতে মাতা যশোদা ও বালক শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কের ভিতর। সেখানেও পুরান মতে জানা গেছে, শ্রীকৃষ্ণ আসলে মাতা দেবকীর সন্তান। কিন্তু তিনি লালিত-পালিত হয়েছিলেন মাতা যশোদার গৃহে। সেখানে সমাজ বাস্তবতা যা ছিল, শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি’র কালের সমাজ বাস্তবতা তা থেকে অনেক দূরবর্তী। তবে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, নারায়ণী ঠিক ঠিক যশোদা নয় কিন্তু বাৎসরের প্রশ্নে সে বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদার অনুরূপিনী। কারণ পরের পুত্রের জন্য যশোদার যে উৎকর্ষা ও হৃদয়ের নানা আলোড়ন, তা যেন সে যুগ বদলে গেলে, সময় বদলে গেলেও একেবারে কোন এক অবিকৃত সত্তায় নারায়ণী চরিত্রে আরোপিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই জাতীয় গল্পগুলি অবশ্যই পারিবারিক নানা জটিলতার টানাপোড়নের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ‘রামের সুমতি’ গল্পে যার অন্যথা হয়নি। রামলাল একটা সময়ে আলাদা হয়ে যেতে চায়। নিজে রান্না করে খায়। আর সেখানে গ্রামের কি পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে সেটা ভেবেই নারায়ণী সম্পর্কে শরৎচন্দ্র লিখেছেন -

“গোপনে কাঁদিয়াছে বোধ করি গতরায়ে নারায়ণীর জ্বর আসিয়াছিল ... উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী মা আমার, দেখে আয় সে ঘরে আছে কিনা?”^৭

কিন্তু পরিণামে নারায়ণীর স্নেহ ও মমতার কাছে রাম হার মানেন। তার সুমতি জাগে। যার নেপথ্যে মা নয়, রামলালের মাতৃস্বরূপা নারায়ণী তার স্নেহের শক্তিতে ভাস্বর। ইতিপূর্বে যে মাতৃত্বের গল্পগুলি আলোচনা করা হয়েছে সেখানে যেসব সন্তানের কথা বলা হয়েছে, তারা কেউই সেই মায়ের নিজের সন্তান নয়। বিভিন্ন পরিস্থিতি ও পরিবেশে তারা তাদের মায়ের কাছে এসেছে। কিন্তু সেদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পটি বেশ ব্যতিক্রমী।

শরৎচন্দ্র যে গ্রাম বাংলার ছবি এঁকেছেন সেই গ্রাম বাংলা কোন সমৃদ্ধ ও অভিজাত বাংলা নয়। যেখানে হ্যাভস ও হ্যাভনটস এর পার্থক্যটা বড় বেশি করে চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দীনবন্ধু কুন্ডু লিখেছেন -

“ ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পটিতে লেখক সেই সমাজ বাস্তবতার নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর রূপটিকে সমাজের সামনে উদঘাটিত করেছেন অসাধারণ দক্ষতায়। এই গল্পে বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত, অসহায় চরিত্র দুটি হল অভাগী ও তার পুত্র কাঙালীচরণ।”^৮

গ্রাম্য দলাদলি ও জাতপাতের কারণে নিম্ন (দলিত) সম্প্রদায়ের মানুষের চরম দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে। সমাজে তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষদের ভদ্রবেশী মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা চূড়ান্ত অভদ্র ও অমানবিক রূপটিকে উদঘাটিত করে তুলেছেন লেখক আলোচ্য গল্পকাহিনির মধ্যে দিয়ে। অভাগী জীবনে বেঁচে থাকতে চাইলেও নিষ্ঠুর সমাজ ব্যবস্থা তাকে কিছু পেতে দেয়নি। এ গল্পের মা হল অভাগী আর তার নিজের সন্তান কাঙালী। একদা ঠাকুরদাস মুখার্জির স্ত্রীর সাড়ম্বর দাহ কাজ দেখে অভাগীর বড় স্বপ্ন জেগে ছিল যে, তার মরণ হলে তার ছেলে কাঙালী নিশ্চিত নিজের হাতে তার মুখে আঙুন দেবে। এবং সেই লকলকে আঙনের শিখার উপর যে ধোয়াড় রাশি, তার ভিতর দিয়ে কোন এক স্বর্গীয় রথে চেপে স্বর্গারোহণে যাবে। কিন্তু যখন অভাগী অসুস্থ হল, কাঙালী ওষুধ নিয়ে এলেও সে বাঁচলো না। কিন্তু সে যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে মরেছিল। গল্পের পরিণামে তা একেবারেই পূরণ হল না। কারণ বাড়ির উঠানের গাছটাকে কোপ মারতেই জমিদারের প্রহরী এসে কাঙালীকে চড় মারলো। দেখা গেল অভাগীর জীবনে একটা চরম ট্রাজেডি। কাঙালী মাত্র এই কয়

ঘন্টায় সমাজ-সংসার থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছিল। অবশেষে সে ধীরে ধীরে তার মরা মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো। শরৎচন্দ্র লিখলেন -

“নদীর চরে গর্ত খুঁড়িয়া অভাগীকে শোয়ানো হইল। রাখালের মা কাঙালীর হাতে একটা খড়ের আঁটি জ্বালাইয়া দিয়া তাহারই হাত ধরিয়া মায়ের মুখ স্পর্শ করা ফেলিয়া দিল। তারপরে সকলে মিলিয়া মাটিচাপা দিয়া কাঙালীর মায়ের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া দিল।”^৯

তখন সবাই সবার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তখনও কাঙালী দেখলো সেই খড়ের আঁটি থেকে স্বল্প ধোঁয়াটুকু ঘুরে ঘুরে আকাশে উঠছে। এ এক মন কেমন করা আবেশ মাতা ও অসহায় পুত্রের নিদারুণ সম্পর্কের ইতিকথা। কোনো মায়ের এমন স্বপ্নভঙ্গ হতে পারে, শরৎচন্দ্রের সে যুগ ও জীবনদর্শনের স্বাভাবিক ফল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর গল্পগুলোকে করে তুলেছেন চরিত্র প্রধান। আর সেই চরিত্রগুলির ভেতর যে চরিত্রটি শরৎচন্দ্রকে দিয়েছে একটা অনন্য মৌলিকতা, সেটি তার মা চরিত্র নির্মাণ। ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীনকাল থেকেই মাতৃত্বের জয়গান নানা রূপে নানা ভাবে মহিমান্বিত করে তোলবার একটা প্রবণতা রয়েছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে যে মাতা ও মাতৃত্বের ছবি এসেছে, সেখানে কোন উদার লোকের আদর্শবাদ নয়, এসে পড়েছে একটা সীমাহীন বাস্তবতা। তাইতো ‘বড়দিদি’ গল্পে দেখা গেল যে মাদবী, সারা গল্পটি জুড়ে ‘দিদি’ সম্বোধন পেয়ে গেল কিন্তু সে দিদি হয়েও প্রমীলাকে যেভাবে স্নেহ, প্রীতি ও ভালোবাসা দিয়ে আগলে রেখেছিল, সেখানে যে সম্পর্ক জনিত রসের উদ্ভাসন, তা এক অনায়াস সাবলীলতায় বাৎসল্যকে অনুসরণ করেছে। অপরপক্ষে প্রকৃত মা হয়ে ওঠার লক্ষ্যে সুরেন্দ্রের বিমাতার যত্নের স্বরূপ ও তার ফলাফল উদঘাটনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লিখেছেন -

“সুরেন্দ্র তাহার কুড়ি বছর বয়সে এম. এ পাশ করে, কতটা তাহার নিজের গুনে কতটা বিমাতার গুণে। এই বিমাতাটি এমন অধ্যবসায়ের সহিত তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিতেন যে, সে অনেক সময় বুঝিতে পারিত না যে, তাহার নিজের স্বাধীন সত্তা কিছু আছে কিনা। সুরেন্দ্র বলিয়া কোনো স্বতন্ত্র জীব এ জগতে বাস করে, না এই বিমাতার ইচ্ছাই একটি মানুষের আকার ধরিয়া কাজকর্ম, শোয়া-বসা, পড়াশোনা, পাশ প্রভৃতি সারিয়া লয়। এই বিমাতাটি নিজের সন্তানের প্রতি কতকটা উদাসীন হইলেও সুরেন্দ্রের হেফাজতের সীমা ছিল না।”^{১০}

‘রামের সুমতি’র নারায়ণী ও ‘বিন্দুর ছেলে’র বিন্দুবাসিনী চরিত্রে সেই একই ধরার অনুসরণ। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অশোক কুমার মিশ্র লিখেছেন -

“শরৎচন্দ্র ছিলেন পল্লীজীবনের কথাকার। তার বহু ছোটগল্পে এদেশের পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। সামাজিক সমস্যা, পারস্পরিক সম্পর্ক শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলিতে আকর্ষণীয় ভাষায় রূপ পেয়েছে। বাংলার জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। ‘রামের সুমতি’র প্রভৃতি গল্পে। নারায়ণীর বালক দেওর রামের প্রতি স্নেহ গল্পটিকে অন্য মাত্র দিয়েছে।”^{১১}

এই মাত্রাটি অবশ্যই বিশেষ এবং তা স্নেহজনিত চিরন্তন মাতৃত্বকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছে।

যারা নিজের রক্তের ছেলে নয়, পরের ছেলেকে যেভাবে আপন করে নিয়েছে, তা যেকোনো স্বাভাবিক মায়ের স্নেহ ও বাৎসল্যকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে বলেই মনে হয়। সে কারণেই বলা চলে, আমাদের সমাজে প্রচলিত মাতৃত্বের ধারণাটিকে টিকিয়ে রেখেই শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটগল্পে একটা অন্য মাতৃত্বেরও ছবি এঁকেছেন বলা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের গল্পগুলিকে যদি তাত্ত্বিক বিচারের দিক দিয়ে মূল্যায়ন করা যায়, তবে দেখা যাবে ছোটগল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত গঠন-রীতিকে অনুসরণ করেননি। আসলে শরৎচন্দ্র লেখবার আগে কতগুলি চরিত্র ঠিক করে নিতেন; তারপর সেই চরিত্র অনুযায়ী গল্প এগিয়ে চলেছে তার পরিণতির পথে। তাঁর মা বিষয়ক গল্পগুলি সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য। এখন দেখা গেল -

ক) শরৎচন্দ্রের মা বিষয়ক গল্পগুলি অবশ্যই চরিত্র নির্ভর।

খ) অবয়বের প্রশ্নে সেই গল্পগুলি বেশ দীর্ঘ। কোন কোন ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বর্ণনামূলক রীতিকে অতিক্রম করে মায়ের সঙ্গে ছেলের কথোপকথনে এসেছে নাটকীয় সংলাপের ব্যবহার। যেমন -

“মা ছেলেকে দুহাতে বুকে চাপিয়ে ধরিল ... কহিল, কাঙালী, আজ তোর আর কাজে গিয়ে কাজ নেই। কাজ কামাই করিবার প্রস্তাব কাঙালীর খুব ভালো লাগিল। কিন্তু কহিল, জল-পানির পয়সা দুটো তো তাহলে দেবে না মা!”^{২২}

গ) অভাগী কাঙালীর নিজের মা না হলেও, গবেষণা পত্রে আলোচিত অন্য মায়েরা যথাক্রমে, সুরেন্দ্রের বিমাতা, বিন্দুবাসিনী, এবং নারায়ণী - এরা কেউই তাদের লালিত সন্তানের জন্মদাত্রী মা নয়। স্বাভাবিক কারণেই মনে হয়, শরৎচন্দ্র তাঁর মাতৃচরিত্র নির্মাণে বায়োলজিক্যাল মায়ের বিষয়টাকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে চাননি।

অতএব, মা হতে গেলে শুধু জৈবিক সত্য নয়, তার বাইরেও এমন অনেক কিছু গুণাবলী আছে, যার মহিমায় যে কোন নারী তার স্নেহ, বাৎসল্য এবং চরম সহনশক্তির গুণে হয়ে উঠতে পারেন প্রকৃত মায়ের সার্থক প্রতিচ্ছবি। যা তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা, নারী-মনস্তত্ত্ব এবং মানবিক সম্পর্কের নানা ঝগড়াপড়ায় একটা এমন মাত্রা পেয়ে গেছে যে, শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মা না হয়েও এমন মায়ের চরিত্রাঙ্কনে শরৎচন্দ্র তুলনা-রহিত। তাইতো একদা ‘দ্য টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট’ - এ বলা হয়েছিল, শুধু উপন্যাস নয়; ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তিনি যে অপূর্ব সমর্থের পরিচয় দিয়েছেন, তা শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, পৃথিবীর যেকোনো সাহিত্যে দুর্লভ।

Reference:

১. দে, সুব্রতকুমার ও কুণ্ডু, দীনবন্ধু, বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প : শিকড়ের সন্ধান, অঞ্জলি প্রকাশনী, ২০২১, পৃ. ভূমিকাংশ।
২. ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২, পৃ. গ্রন্থ-পরিচিতি অংশ।
৩. তদেব, পৃ. ১৫
৪. তদেব, পৃ. ৭৩২
৫. তদেব, পৃ. ৭৫২
৬. মিত্র, দিলীপ কুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয়, দিশারী পাবলিকেশন, ২০১৬, পৃ. ৩৪৬
৭. ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২, পৃ. ৭৮২-৭৮৩
৮. দে, সুব্রত কুমার ও কুণ্ডু, দীনবন্ধু, বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প: শিকড়ের সন্ধান, অঞ্জলি প্রকাশনী, পৃ. ভূমিকাংশ।
৯. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২, পৃ. ৬৯৩
১০. ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২, পৃ. ১৫
১১. মিশ্র, অশোক কুমার, বাংলা ছোটগল্পের রূপরেখা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ২০১৭, পৃ. ৭৮
১২. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২, পৃ. ৬৮৯

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

- ঘোষ, সুধাংশুরঞ্জন, শরৎ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২
 চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২
 চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), তুলি কলম, ১৯১২

সহায়ক গ্রন্থ :

- মিশ্র, অশোক কুমার, বাংলা ছোটগল্পের রূপরেখা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯১৭

দে, সুব্রত ও কুণ্ডু, দীনবন্ধু, বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প : শিকড়ের সন্ধান (সম্পাদিত), অঞ্জলি প্রকাশনী, ২০২১
চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, ২০১২
চৌধুরী, শীতল, বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১০
মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার, শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার, দে'জ, ১৯৯৬
মল্লিক, পীরপদ, বিশ শতকের কথাসাহিত্য চর্চা, প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০২১
শর্মা, মমতাদাস, প্রবন্ধ মালা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০১৭

পত্র-পত্রিকা :

নতুন গল্পপত্র, সম্পাদক: শঙ্কর চক্রবর্তী, ২০২১
এবং মছয়া, সম্পাদক: মদন মোহন বেরা, ২০১৯
শারদ সংখ্যা মিস, সম্পাদক: চন্দন বাঙ্গাল ও অভীক প্রধান, ২০১৮
চান্দ্রভাষ, সম্পাদক: অজিত ত্রিবেদী, ২০১৭
কবিতীর্থ, সম্পাদক: উৎপল ভট্টাচার্য, ২০২১